পাঠ-পর্যালোচনাবিষয়ক সাময়িকী

প্রেক্ষা

পঞ্চম সংখ্যা

পাঠ–পর্যালোচনাবিষয়ক সাময়িকী

প্রেক্ষা

পঞ্চম সংখ্যা

সম্পাদনা
মাসুম বিল্লাহ আরিফ

সম্পাদনা সহযোগী
সোহান আল মাফি
ফরহাদ হাসান
সুলতানা ইয়াসমিন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চের একটি প্রকাশনা
প্রকাশকাল: আগস্ট, ২০২১

সম্পাদকীয়

সন্তানের টলমলানো পদক্ষেপ থেকে হাঁটতে শেখা– জনক জননীকে যেমন স্বর্গীয় প্রশান্তি দেয়, প্রেক্ষার চলতি সংখ্যাটিও তেমন আমাদের হৃদয়দেশে প্রশান্তির হাওয়া বইয়ে দিয়েছে। একটি নতুন চিন্তার বীজ বুনেছি আমরা, স্বল্প সময়ে তা ডালপালা ছড়িয়ে পরিণত বৃক্ষে রূপান্তরিত হচ্ছে ক্রমশ।

আমরা বরাবরই বলে আসছি, প্রেক্ষা পাঠকদের লেখক হিসেবে দেখতে চায়। পাঠকের বিশ্লেষক সত্তাটির বিকাশ ঘটাতে চায়। প্রেক্ষার প্রতিটি সংখ্যা তাই আদতে এক একটি পাঠক সমাবেশ।

বাংলাভাষী বিশাল পাঠক গোষ্ঠীর প্রত্যেককেই আমরা নিজেদের সহচর মনে করি। নানা মত, পথ আর বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও পাঠক পরিচয়ে আমাদের সম্মিলন ঘটুক প্রেক্ষাঙ্গনে। প্রেক্ষার সাথে পাঠক–লেখকদের বন্ধন আরো সুদৃঢ় হোক, পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশের মাহেন্দ্রক্ষণে পরম করুণাময়ের নিকট তাই কামনা করছি।

সূচীপত্র

০৪ মুক্তিযুদ্ধ এবং আমাদের বাংলাদেশ *সুমাইয়া বরকতউল্লাহ*

০৭ শুয়রের রাজত্ব *মাজহারুল ইসলাম*

০৯ এক পূর্বঘোষিত বিজয়–উপাখ্যান *সাদিয়া ফাতেমা মীম*

১২ জোছনাফুলের নির্যাস *আরাফাত শাহীন*

১৫ যেখানে মানুষ মহান *মাসুম বিল্লাহ আরিফ*

১৯ রূপান্তর *নাফিস সাদেকীন*

২৩ নীলগঞ্জ গ্রাম *নাইমা সুলতানা*

২৫ ভিন্ন স্বাদের আলাপ *মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান*

২৮ লাখো তরুনের স্বপ্ন জয়ের শক্তি *নবাব আব্দুর রহিম*

৩১ অন্যকিছু একটা পড়লাম আমি *মাহবুব এ রহমান*

৩৩ এক জেলেকন্যার সম্রাজ্ঞী হয়ে ওঠার গল্প *অরিত্র রোদ্দুর ধর*

মুক্তিযুদ্ধ এবং আমাদের বাংলাদেশ

সুমাইয়া বরকতউল্লাহ্

বাঙালি জাতিকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম ও লড়াই করতে হয়েছে দীর্ঘ সময় ধরে। তার চূড়ান্ত পরিণতি দেখা মিলে ১৯৭১ এর মার্চে। একাত্তরের মার্চ থেকে ডিসেম্বর, টানা নয় মাস, বাঙালির জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। নয় মাসের স্নায়ুবিক, শারীরিক আর কৌশলগত যুদ্ধ, যার সমষ্টিগত নাম– মুক্তিযুদ্ধ, এর মধ্য দিয়ে আমরা লাভ করেছি আমাদের ঈপ্সিত স্বাধীনতা। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের দিয়েছে স্বাধীন এবং অস্তিত্বের বাংলাদেশ।

মুক্তিযুদ্ধের তথ্যসমৃদ্ধ বই হাতে নিলেই পাঠক-মন কয়েকটি বিষয়ে বেশ সজাগ থাকে। যুদ্ধভিত্তিক তথ্যের স্বচ্ছতা, সমন্বয়, বিশ্লেষণ, ধারাবাহিকতা ও উপস্থাপন এবং সেই সাথে ভাষার শাণিতরূপ ও প্রাঞ্জলতা থাকলে পাঠকের চাহিদা ষোলকলা পূর্ণ হয়ে যায়। আমি যে বইটি নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি, সে বইটা পড়ে আমার পাঠকসত্তা যথার্থ তৃপ্তি পেয়েছে এবং আমি জ্ঞান লাভ করেছি মুক্তিযুদ্ধের, বিশেষ করে ঢাকা জেলার তৎকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে।

বইটি পড়ার সময় মনে হচ্ছিল, আমিও বুঝি যুদ্ধে অংশ নিয়েছি! চমৎকার এই বইটির নাম– *'মুক্তিযুদ্ধের কিশোর ইতিহাস (ঢাকা জেলা)'*।

বাংলাদেশের সবকটি জেলার প্রত্যেকটির নিজস্ব ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসগুলো সংগ্রহ করে 'মুক্তিযুদ্ধের কিশোর ইতিহাস' এর জেলাভিত্তিক বইগুলো যেন সত্যিই আমাদের নিয়ে যায় সেই রক্তাক্ত ও সাহসী সময়ে। এই গ্রন্থমালার প্রতিটি বইয়েই আছে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ধারাবাহিক সুস্পষ্ট তথ্যমালা, যা এই গ্রন্থমালাকে নিয়ে গেছে এক অনন্য উচ্চতায়। আমি যেহেতু ঢাকা জেলার বইটি পড়েছি, তাই এর সম্বন্ধেই বলে যাই।

বইটির লক্ষ্য ছিল কিশোর-কিশোরীদের কাছে ঢাকাসহ সারাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একটি বিশদ চিত্র তুলে ধরা। কারণ এই দেশের একজন কিশোর বা কিশোরী কিংবা তরুণ যখন এই আত্মত্যাগ, বীরত্ব আর অর্জনের ইতিহাস জানবে - উপলব্ধি করবে, তখন দেশকে সে উপহার দিবে নতুন ভালোবাসাময় পথ, যার মাধ্যমে আমরা পাব আরও সুন্দর এবং প্রত্যাশার বাংলাদেশ।

বইয়ে উল্লেখিত মুক্তিযুদ্ধের অন্যান্য ঘটনাবলীর মধ্য থেকে মর্মস্পর্শীভাবে ফুটে ওঠা 'অপারেশন সার্চলাইট' এর কিছু অংশ তুলে ধরতে চাই আলাদা করে। *"২৫ মার্চ রাতের শেষাংশে অর্থাৎ ২৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল ও জগন্নাথ হলে আক্রমণ চালানো হয়। রিকয়েললেস রাইফেল, রকেট লাঞ্চার, মেশিনগান, মর্টারের মত মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করে পাকিস্তানি জল্লাদবাহিনী। একদিকে আধুনিক মারণাস্ত্র, অন্যদিকে নিরস্ত্র সাধারণ ছাত্র। লুকিয়ে থাকা ছাত্রদের ধরে ধরে হত্যা করে তারা। আর যেখানে যাকে যে অবস্থায় পেয়েছে, সেখানেই তাকে হত্যা করেছে। বিভিন্ন ভবনে আগুনও লাগিয়ে দেয় তারা, যাতে ভেতরে থাকা সব মানুষ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। একের পর এক হত্যাকাণ্ডে মেতে ওঠে এই জাল্লাদবাহিনী। সেই হত্যাকাণ্ডের শিকার হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারী এবং তাদের নিকটজনেরা। পাকিস্তানি খুনিদের নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকে নির্দেশ আসে সূর্য উঠার আগেই লাশগুলো গুম করে ফেলার জন্য। এত লাশ সৈন্যরা মাটিচাপা দিতে পারছিল না। তখন ওরা পলায়নরত লোকজন ধরে এনে তাদের দিয়ে গর্ত করে লাশগুলো মাটিচাপা দেয়। যাদের দিয়ে গর্ত করা হয় তাদেরও লাইন করে দাঁড় করিয়ে সেখানেই তাদের গুলি করে লাথি দিয়ে গর্তে ফেলে দেয় পাষণ্ডের দল। তারপর বুলডোজার দিয়ে মাটিচাপা দিয়ে দেয়।"*

এরকম ঢাকা জেলার প্রত্যেকটি আক্রান্ত স্থানের স্পষ্ট বিবরণে আমার রক্তে ঝড় ওঠছিল বারংবার।

তারপর এলো পাকিস্তনি হানাদার বাহিনীদের সহযোগিতা করা এদেশের কিছু স্বার্থবাদী মানুষদের নিয়ে গঠিত বিভিন্ন বাহিনী ও কমিটি। যেসব বাহিনী সে সময় ঢাকায় নৃশংসতা চালিয়েছে সেগুলো হলো পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি, পূর্ব পাকিস্তান শান্তি ও কল্যাণ কাউন্সিল, রাজাকার বাহিনী (যাদের কিনা প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন সংলগ্ন মাঠে এবং মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের মাঠে!), আলবদর এবং আলশামস বাহিনী (ডেথ স্কোয়াড)। যুদ্ধ চলাকালীন নয় মাসে ঘর-বাড়ি ধ্বংস, লুটপাট ও হত্যাকাণ্ডে পাকিস্তানি বাহিনীকে সহায়তা করে যায় এই অকৃতজ্ঞ পঙ্গপালেরা। বাংলাদেশের ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গাকে তারা পরিণত করে রায়েরবাজার, মিরপুর ও রোকেয়া হলের মত বধ্যভূমি ও গণকবরে।

বইটির বিপুল তথ্যসম্ভার এই স্বল্প পরিসরে পুরোপুরি বর্ণনা করা অবশ্যই দুষ্কর। তবে বিজয়ের আনন্দটাকে তো প্রকাশ করাই যায় প্রতি মুহূর্তে! ডিসেম্বরের শুরুতেই মুক্তিবাহিনী ও স্বাধীনতাকামী জনগণ বুঝতে পারে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পরাজয় আসন্ন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ ও তৎকালীন দূরদর্শী নেতা ও কমান্ডারদের পরিচালনায় গেরিলা ও মুক্তিযোদ্ধারা তাদের তৎপরতা আরও বাড়িয়ে দেয়। ডিসেম্বরের ১ তারিখ থেকে ১৬ তারিখ পর্যন্ত শুধু ঢাকা ও আশেপাশের

অঞ্চলে তাদের আক্রমণের ধরন লক্ষ্য করলেই পাকিস্তানের আতঙ্কের অবস্থাটা বোঝা যাবে, যা এই বইয়ে তারিখ উল্লেখ করে বর্ণনা করা হয়েছে। এবং বইটিতে প্রসঙ্গক্রমে যোগ করা হয়েছে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ছবি।

বইয়ের বর্ণনা এমনই বাস্তবধর্মী ছিল, যেগুলো পড়ে পাঠক অনুভব করতে পারবে তখনকার প্রতিটি মুক্তিকামী মানুষের স্পৃহা ও দেশপ্রেম। তাই যখন পড়ছিলাম এই সেই রেসকোর্স ময়দান (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) যেখানে মাত্র ৯ মাস আগে ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছিলেন *"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"* আর এখানেই ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনারা আত্মসমর্পণ করে। দেহের প্রতিটি রন্ধ্রে জেগে উঠেছিল এক পবিত্র সুখ!

আর বইয়ে ১৯৪৭, '৫২, '৬২, '৬৬, '৬৯, '৭১ এর মত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর খুঁটিনাটি তথ্য তো রয়েছেই, সেই সাথে এর পারিপার্শ্বিক সকল ঘটনার সম্মিলন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে খুব সুন্দর এবং গোছানোভাবে।

মুক্তিযুদ্ধ-সম্পর্কিত বইগুলোতে তুলনা করার কোনো সুযোগ নেই আসলে। প্রতিটা বই-ই লেখক ও সম্পাদকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের অনেক পরিশ্রম এবং নিখাঁদ দেশপ্রেমের বহিঃপ্রকাশ। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সকল বইয়ের প্রতি সম্মান রেখেই বলছি, *'মুক্তিযুদ্ধের কিশোর ইতিহাস (ঢাকা জেলা)'* বইটি কিশোর-কিশোরীসহ সবার মনে দেশপ্রেম এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগাতে সফল হবে বলেই আমি বিশ্বাস করি।

***** মোস্তফা হোসেইন রচিত বই মুক্তিযুদ্ধের কিশোর ইতিহাস (ঢাকা জেলা)। ধ্রুব এষের প্রচ্ছদে বইটি প্রকাশ করেছে তাম্রলিপি। বাংলাদেশের ইতিহাস নির্ভর এই পুস্তকটির পাঠ–পর্যালোচনা লিখেছেন– প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সুমাইয়া বরকতউল্লাহ।***

শুয়রের রাজত্ব

মাজহারুল ইসলাম

অ্যানিমেল ফার্ম– পশুর খামার। নাম থেকে বিষয়বস্তুর কিছুটা ধারণা পাওয়া গেলেও বইটি নিছক পশুপাখিকে কেন্দ্র করে নয়, বরং এর পরিসর আরও বিস্তৃত।

এ ধরনের উপন্যাসকে বলে রূপকধর্মী উপন্যাস। প্রতীকের মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয় অন্য গল্পের। অ্যানিমেল ফার্ম হল একটি রূপকধর্মী ব্যাঙ্গাত্মক উপন্যাস। জোসেফ এ. স্ট্যালিনের সময়কার সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার পটভূমিকে ব্যাঙ্গকরেই বইয়ের মূলভাব আবর্তিত হয়েছে।

উপন্যাসটির গল্প অনেকটা এরকম– মিস্টার জোন্স একটি খামারের মালিক। খামারের নাম ম্যানর ফার্ম। খামারের পশুরা জোন্সের উপর ভীষণ ক্ষ্যাপা। কেবল মিস্টার জোন্স নয়, দুপেয়ে সমস্ত মানুষের ওপরেই তারা ক্ষ্যাপা। পশুদের নেতা ওল্ড মেজর; একটি বৃদ্ধ শূকর। এক রাতের সভায় সে একটি ঐতিহাসিক ভাষণ দেয়–

পশুর জীবন কষ্টকর এবং অল্প সময়ের। এই জীবনের পুরোটা জুড়ে তারা মানুষকে কেবল দিয়েই যায়। অথচ মানুষ এর বদলে তাদের প্রতি সদয় হওয়া তো দূরের কথা, যখন তারা বৃদ্ধ হয়, কাজে অক্ষম হয় মানুষ তাদের কেটে খেয়ে ফেলে। কিন্তু এইভাবে আর চলতে দেয়া যায় না।

ওল্ড মেজর বলেন, *তিনি স্বপ্ন দেখেন এই পশুরা একদিন মানুষের কাছ থেকে মুক্তি ছিনিয়ে নেবে এবং নিজেদের একটি আলাদা সমাজ গড়বে।*

বক্তব্য প্রদানের পরদিনই ওল্ড মেজরের মৃত্যু হয় ।

ওল্ড মেজর মারা যাওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই ম্যানর ফার্মের সমস্ত পশুপাখিরা স্নোবল নামে একটি শূকরের অধীনে একজোট হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং মিস্টার জোন্সকে খামারবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করে।

ম্যানর ফার্মের নাম পাল্টে তারা রাখে অ্যানিমেল ফার্ম। বিজ্ঞতার দিক দিয়ে খামারের পশুদের মধ্যে স্নোবল সেরা। সেই নেতা বিবেচিত হয়। খামারটিকে পুরোপুরি ঢেলে সাজানোর কাজে স্নোবল নিজেকে আত্মনিয়োগ করে। পশুদের পড়াশোনা শেখানোর ব্যবস্থা করে, খামার কীভাবে চলবে সেসব নীতিমালা ঠিক করে। ধীরে ধীরে অ্যানিমেল ফার্ম হয়ে ওঠে পশুদের সুখের রাজ্য। কিন্তু সুখ কি আর

চিরদিন থাকে? নেপোলিয়ন নামে আরেক শূকর স্নোবলকে খামার থেকে উচ্ছেদ করে নিজে ক্ষমতা কেড়ে নেয়। খামারে শুরু হয় দুঃখের দিন। শুরু হয় পশুতে পশুতে বৈষম্য।

শূকররা পরিণত হয় সুবিধাবাদি শ্রেণীতে। নেপোলিয়ন হয়ে ওঠে এক স্বৈরাচারী নিষ্ঠুর শাসকের নাম। খামারে খাদ্য সংকটের হেতুতে পশুদের খাদ্যের রেশন কমিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু শূকরদের বিলাসী জীবনের কোনো ব্যত্যয় ঘটে না। যে দুপেয়ে মানুষের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখা যাবে না বলে আইন ছিল সেই মানুষের সঙ্গে নেপোলিয়ন ব্যবসা আরম্ভ করে। ডিম, দুধ বিক্রি করে তার বদলে শূকরদের জন্য কেনা হতে লাগল মদ।

অ্যানিমেল ফার্মে বক্সার নামে সবচে' পরিশ্রমী ঘোড়াটি আহত হয়ে কাজে অক্ষম হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে ভর্তির নামে কসাইয়ের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়। বড়ই করুণ কাহিনী।

খামারের পশুরা একসময় বুঝতে পারে নেপোলিয়ন ও মিস্টার জোন্স এ দুই চরিত্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। বরং মিস্টার জোন্সের চেয়ে নেপোলিয়ন আরো খারাপ।

এবার দেখি লেখক তার পশু চরিত্রগুলোর আড়ালে আসলে কাদের কথা বলতে চেয়েছেন। ওল্ড মেজর নামে বৃদ্ধ শূকরের চরিত্রটি এখানে কাল মার্ক্সের প্রতীক; যে একটি ইউটোপিয়ান পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে। স্নোবল হল ট্রটস্কির প্রতীক। আর নেপোলিয়নকে উপস্থাপন করা হয়েছে স্ট্যালিনের চরিত্র দিয়ে; সমাজতন্ত্রের সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

বিপ্লব পরবর্তী ধাপে একনায়কতন্ত্র, স্বেচ্ছাচারিতা আর সুবিধাবাদের যে জয়জয়কার পৃথিবীর নানা প্রান্তে কায়েম হয় তার বাস্তব একটি চিত্র লেখক এঁকেছেন তার বইয়ে। তবে লেখক নিজে একজন পুঁজিবাদী আদর্শের ধারক হিসেবে সমাজতন্ত্র ও রাশিয়ার বিপ্লবকে নিজের চশমা দিয়েই দেখেছেন এবং পক্ষপাতমূলক চিত্র এঁকেছেন বলে অনেকে মনে করেন।

এ বইয়ের শেষ উক্তিটা মনে খুব দাগ কাটে–

"All animals are equal but some animals are more equal than others."

*** পশ্চিমা লেখক জর্জ অরওয়েল তুমুল পরিচিত বই অ্যানিমেল ফার্ম নিয়ে প্রেক্ষার এই সংখ্যায় লিখেছেন মাজহারুল ইসলাম। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষার্থী।*

এক পূর্বঘোষিত বিজয়ের উপাখ্যান

সাদিয়া ফাতেমা মীম

থ্রিলার ও এডভেঞ্চার বই পড়তে আমার বরাবরই অনেক ভাল লাগে। সেই সাথে মানবেতিহাস জানারও প্রবল আগ্রহ রয়েছে। কিন্তু থ্রিলার ও ইতিহাসের সংমিশ্রণে একটি বই পাওয়া গেলে কেমন হবে? 'সানজাক-ই উসমান' এই দুইয়ের সমন্বয়ে এক অনন্য সৃষ্টি। লেখক প্রিন্স মুহাম্মদ সজল বলেন, *"এটা একই সাথে ইতিহাস, ফিকশন আর থ্রিলার।"*

বুরখান খালদুনে রক্তপিণ্ড হতে জন্ম নেওয়া নিষ্পাপ শিশুটির হৃদয় সেদিনই লোহার মতো শক্ত হতে শুরু করেছিলো, যেদিন বাবার মৃত্যুতে নির্বাসনে গিয়ে নিজ সৎভাইয়ের কাছে আপন মাকে প্রতিরাতে ধর্ষিত হতে দেখেছিলো। এরপর প্রিয়তমা স্ত্রীর অপহরণের পর তেমুজিন বুঝলো, শক্তি ছাড়া মোঙ্গল সমাজে টিকে থাকা অসম্ভব। নিজের জীবনের থেকেও সবচেয়ে প্রিয় মা আর স্ত্রীর সাথে হওয়া এই অন্যায় থেকেই তার উপলব্ধি হলো, মানবজাতির বাঁচার পথ একটাই, আর তা হলো যুদ্ধ। তিনি হয়ে উঠলেন ক্ষমতালোভী দুর্ধর্ষ মৃত্যুর সম্রাট চেঙ্গিস খান। তারপর ইয়াজুজ-মাজুজ নামধারী আতংক হয়ে উড়িয়ে দিলেন তৎকালীন সমস্ত শক্তিশালী সাম্রাজ্য।

সমসাময়িক মুসলিম সাম্রাজ্য তখন বিভেদের বেড়াজালে বন্দী। স্বার্থান্বেষী মহলের মানসিক দীনতায় ক্রমাগত তাদের পতন হতে লাগলো। আর এটাকেই অন্যতম সুযোগ গ্রহণ করলেন মোঙ্গলদের খান-ই-খানান চেঙ্গিস খান। শহরের পর শহর, সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য এমনভাবে ধ্বংস করে দিতে থাকলেন যে, তার যাত্রাপথে সুন্দর বলে কিছু আর অবশিষ্ট থাকত না। শুধু মানুষের মুণ্ড কর্তন করেই ক্ষান্ত হতেন না তিনি, সেখানে বসবাসরত পশু–পাখিগুলোও চরম নৃশংসতার শিকার হতো।

তার এই ধ্বংসলীলা রোধে কার সাধ্য! না না, সাধ্য আছে সেই তুর্কি তরুণের; যাকে দেখে জীবনের সায়াহ্নে এসে চেঙ্গিস খান বলে উঠেছিলো, *"আহা, আমার যদি এমন একটা ছেলে থাকতো!"* সে আর কেও নয়, সুলতান জালালুদ্দিন মিংবার্ন।

'ঈশ্বরের অভিশাপ' চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে মৃত্যুর বিভীষিকা থেমে যায়নি। তার উত্তরাধিকারীরা আবারো বেরিয়ে পড়লো বিশ্বজয়ে। কিন্তু নাতি বারকি খানের ইসলাম গ্রহণের মধ্য দিয়েই ইসলাম তাদের জয় করে নিল! ফাটল ধরল, শুরু হল মোঙ্গলদের গৃহযুদ্ধ। অপরাজেয় মোঙ্গলদেরকে পরাজিত করলেন অকুতোভয় মিশরের মামলুক। সাইফউদ্দীন কুতুজ আর রোকনুদ্দীন বাইবার্সের মিলিত শক্তিতে আইনে জালুতের যুদ্ধে প্রথমবার পরাজয় বরণ করে মোঙ্গলরা। বদরের যুদ্ধ খ্যাত এই যুদ্ধেই সর্বপ্রথম ভীত হলো মোঙ্গলরা।

অপরদিকে, মোঙ্গলদের হাত থেকে প্রাণে বাঁচতে খোরাসান আর তুর্কিস্তান থেকে সবাই ছুটছে আনাতোলিয়ার দিকে। জগৎজোড়া খ্যাত মাওলানা জালালুদ্দিন রুমিও শিশুকালে বাবা বাহাউদ্দীন ওয়ালাদের সাথে জন্মভূমি ত্যাগ করেন অন্যান্য কাফেলাদের সাথে। উসমানী সাম্রাজ্যের প্রাণ পুরুষ আরতুগ্রুল বে'র কাফেলাও ছিল ভূমি হারানো দলে। পরবর্তীতে এই কাফেলাই আনাতোলিয়ায় স্থাপন করে বিশ্বের ইতিহাসে এক নতুন মুসলিম সাম্রাজ্য। এই সেই সাম্রাজ্য, যা একদিকে সমকালীন প্রতিপক্ষ আমীর তাইমুরের কাছে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে বিক্ষিপ্ত হয়, আবার অন্যদিকে কন্সট্যান্টিনোপল জয় করে পূর্ণ করে রাসূল সাল্লালাহি আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই ভবিষ্যতদ্বাণী–

"মুসলিমরা একদা কনস্টানটিনোপল বিজয় করবে। তাদের সেই বিজয়ী কমাণ্ডার কতই না সৌভাগ্যবান। সেই বিজয়ী সেনাদল কতই বরকতময়।"

এই বইয়ের বিশেষ কয়েকটি দিক নিয়ে বলি–

- ডার্ক কফি ব্যাকগ্রাউন্ড আর মাঝখানে আরবি ক্যালিগ্রাফি এবং সোনালী কালির অপূর্ব সংমিশ্রণে তৈরি বইটির প্রচ্ছদ পাঠকের জন্য আকর্ষণীয়। আর বইয়ের সূচিপত্রে অধ্যায়ের নামগুলো পড়লে যে কেউ বইটার প্রতি আগ্রহী হবে। ফ্ল্যাপ, ব্যাকপার্ট, ভূমিকা, নির্দেশিকা, সূচীপত্র; প্রতিটা জিনিসই যেন পাঠকের পাথেয়।

- ইতিহাস গ্রন্থের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– সত্যতা। অনেক আগে একটা প্রবাদ পড়েছিলাম যার মূল কথা, *'জয়ীরাই ইতিহাস লেখে'*। অর্থাৎ, ক্ষমতাসীন দল বিজয়ের পর ইতিহাস বদলে দেওয়ারও ক্ষমতা রাখে। এমতাবস্থায়, কেউ যদি ইতিহাস নিয়ে লেখে তবে পাঠক প্রথমেই তথ্যসূত্র চায়। এই গ্রন্থে লেখক যে শুধু তার তথ্যগুলোর গ্রন্থসূত্র গতানুগতিকভাবে বইয়ের শেষে দিয়েছেন তা নয়, বরং প্রতি পৃষ্ঠায় ফুটনোটের মাধ্যমে সূত্র সম্পর্কিত বিতর্ক সমূলে উৎপাটন করেছেন।

- লেখক তারিখের ক্রমানুসারে না গিয়ে ইতিহাসকে থ্রিলারে পরিণত করেছেন তার অসাধারণ লেখনির মাধ্যমে। একটি প্লটের সাথে অন্যটির সংযোজন ছিল বোধগম্য ও আকর্ষণীয়।

- থ্রিলার গল্পে টুইস্ট থাকবে না তা কি হয়? পুরো বইতেই এতো টুইস্ট আছে যে, ইতিহাস পাঠে অচেনা এক স্বাদ অনুভূত হয়।

ইতিহাস পাঠ করতে অনেকে আগ্রহী হলেও পড়তে গিয়ে একঘেয়েমিপনার শিকার হন। কিন্তু 'সানজাক-ই-উসমান' এর লেখক বই এর প্রতিটি পাতায় ইতিহাসের প্রতিটি প্লটকে এমনভাবে সাজিয়েছেন যে একঘেয়েমির প্রশ্নই আসে না। লেখক তার চমৎকার লেখনির মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন অপরাজেয় মোঙ্গলদের পরাজয় বরণ থেকে উসমানী সাম্রাজ্যের সানজাক তথা পতাকা উত্তোলনের দূর্দান্ত দাস্তান। সেই সোনালী ইতিহাসের ঘটনা প্রবাহে শত-সহস্র বছর পরেও অটোমানদের দুনিয়ায় নিজেকে আবিষ্কার করছিলাম বইটি পড়তে পড়তে। লেখকের ভাষায়,

"This is a time Travel, Start your journey!"

***** তরুণ লেখক প্রিন্স মুহাম্মাদ সজলের প্রথম বই 'সানজাক-ই-উসমান' এর নানা দিক নিয়ে লিখেছেন– সাদিয়া ফাতেমা মীম। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী।***

জোছনাফুলের নির্যাস

আরাফাত শাহীন

ক.

আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীবের 'জোছনাফুল' পড়ে শেষ করলাম। এখনও একটা ঘোর-মেশানো ভালোলাগা কাজ করছে বুকের ভেতর। আমাদের সমবয়সী একজন মানুষ তার চিন্তার গভীরতা এবং ভাষার প্রাঞ্জলতায় কতদূর এগিয়ে গেছেন, বইটি না পড়লে বোঝার সাধ্য ছিল না। ভাববেন না বাড়িয়ে বলছি। এই জাতীয় বইয়ের প্রশংসা করতে না পারলে নিজেকে বড় অপরাধী বলে মনে হয়।

প্রায় বছরখানেক হলো ইতিহাস আর ধর্মীয়বিষয়ক বইপত্র পড়তে পড়তে নিজের গতি কেমন শ্লথ হয়ে এসেছিল; একটা আড়ষ্টতা যেন চেপে বসেছিল ভারি বোঝার মতো। 'জোছনাফুল' সেই ভারি বোঝাটাকে হালকা করেছে। পড়াশোনায় একটা উদ্যমমাখা গতি ফিরে এসেছে আবার। শান্ত পুকুরে ঢিল ছুঁড়ে কাঁপন তোলার মতো একটা ঢেউ জেগে উঠেছে চিন্তার জগতে।

খ.

প্রবন্ধগল্পের বই 'জোছনাফুল'। মানে–লেখক এখানে প্রবন্ধ লিখেছেন গল্পের আদলে। অথবা এমনও হতে পারে–তিনি গল্প বলছেন প্রবন্ধের মতো করে। প্রতিটি লেখা শুরু হয়েছে লেখকের নিজের কোনো গল্প দিয়ে। কিন্তু ধীরে ধীরে যখন তিনি গভীরে প্রবেশ করেছেন, তখন সে গল্প আর তার একার থাকে না; গল্পের অংশ হয়ে পড়ি আপনি আমি সকলেই।

আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীবের ভাষাজ্ঞান বেশ ঋদ্ধ। বাংলা, আরবি, উর্দু, ইংরেজি ভাষাগুলো তার বেশ ভালোমতো আয়ত্ত আছে বলেই মনে হয়। তা না হলে সরাসরি উর্দু বা আরবি থেকে অনুবাদ করা সম্ভব হতো না। অনুবাদ তো শুধু অনুবাদই নয়–একেবারে কাব্যানুবাদ!

মোট চৌদ্দটি লেখা স্থান পেয়েছে 'জোছনাফুল' গ্রন্থে। এদের মধ্যে 'তোমাকে ভালোবাসি কেন' একটি পুরো কবিতা এবং কবিতাটি বইয়ের শেষে সংযুক্ত হয়েছে। তাছাড়া বাকিগুলো প্রবন্ধ অথবা গল্প–যা খুশি সেই নামেই ডাকা যায়।

গ.

আমি গভীর মনোযোগের সাথে বইটি পড়েছি। যখন ভাষার দিকে নজর পড়েছে তখন ক্ষণিকের জন্য মনে হয়েছে, আমি যেন আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদের 'ভালোবাসার সাম্পান' পড়ছি। আবার যখন চিত্রকল্প কিংবা উপমার দিকে খেয়াল এসেছে, তখন মনে হয়েছে আমার সামনে বুঝি সৈয়দ আলী আহসানের 'জীবনের শিলান্যাস'!

আমার প্রিয় লেখকদের একজন বুলবুল সরওয়ার। তার 'ঝিলাম নদীর দেশ' আমাকে মোহাবিষ্ট করে রেখেছে বহুদিন। আহা! এমন ভ্রমণ-উপন্যাস ক'টাই বা আছে বাংলা সাহিত্যে! 'জোছনাফুল' দু-একবার আমাকে এই বইয়ের কথাও মনে করিয়ে দিয়েছে। বুলবুল সরওয়ারও তো লেখার ফাঁকে ফাঁকে মানানসই কবিতার লাইন ব্যবহার করেন!

'জোছনাফুল' বইয়ে প্রচুর তথ্য রয়েছে। গ্রন্থপঞ্জি–তে আরবি, বাংলা, ইংরেজি মিলিয়ে যে বিয়াল্লিশটি বইয়ের তালিকা রয়েছে তাতেই বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যাবে। তবে লেখক কোথাও পাণ্ডিত্য ফলানোর চেষ্টা করেছেন বলে মনে হয়নি। কেন যেন মনে হয়েছে, নিজের মতো তিনি তার লেখা থেকেও কিছুটা আড়ালেই অবস্থান করেছেন!

ঘ.

"শক্তিমান কবিদের কৃতিত্ব এখানেই। তারা প্রচলিত পথে হাঁটেন না, নিজস্ব পথ প্রচলন করেন। চলমান স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটতে সবাই পারে না। এর জন্য যোগ্যতা, আত্মবিশ্বাস, উদ্যম, সাহস ও শক্তির প্রয়োজন।" সূর্যশৌর্য শিরোনামের লেখাটির এমন বক্তব্যের সঙ্গে আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীবকে মেলাতে গেলে দেখতে পাই, অবিশ্বাসের রণহুংকারে তিনি বিশ্বাসের ঝাণ্ডাহাতে শক্তপায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ভাষার ওপর তার যে দখল, তাতে মনে হয়েছে, তিনি বহু বিশ্বাসী লেখকের পথপ্রদর্শক হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারবেন।

ঙ.

এতক্ষণ তো শুধু প্রশংসাই করে চললাম। এই বইয়ের কি কোনো নিন্দামন্দ নেই? হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। একটা বইয়ের সমালোচনা না থাকলে তা লেখা পুরোপুরি বৃথা। তবে এই বইয়ে সামান্য সমালোচনা করার যে জায়গা রয়েছে, সেটা লেখকের বয়সের কারণে। একটা মানুষের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীবের লেখায় সামান্য যেটুকু অপরিপক্কতা সেটা

বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে যাবে বলে বিশ্বাস করি।

"মানুষের জীবনে এগিয়ে যেতে শেখা যতটা জরুরি, কোথায় গিয়ে থামতে হয়, সেটা বুঝতে পারা তার চেয়ে বেশি জরুরি।" (নীলমিল; পৃষ্ঠা-১২৩) নজীব জানেন তার লেখায় কোথায় গিয়ে থামতে হবে। লেখকের মতো আমারও জানা দরকার শেষবিন্দু সম্পর্কে। তাই এখানেই সমাপ্তি টানছি।

***** 'জোছনাফুল' আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীবের এক ভিন্ন ধাঁচের সৃষ্টি। নজীব খুব অল্প বয়সেই সাহিত্যাঙ্গনে নিজের অবস্থান তৈরি করে নিয়েছেন। জোছনাফুল পাঠ করে নিজের অনুভূতি প্রেক্ষার পাঠককুলের সাথে ভাগাভাগি করেছেন– আরাফাত শাহীন। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন।***

যেখানে মানুষ মহান

মাসুম বিল্লাহ আরিফ

ক.

দূর্গার গল্প শোনাব আজ। না, দেবী দূর্গা নয়। আমি আজ যে দূর্গার গল্প বলবো, সে বিভূতিভূষণের দূর্গা। বড্ড ছেলেমানুষ। দিনভর বনে–জঙ্গলে টইটই করা তার কাজ। সকাল হতেই বেরিয়ে যায়। বেলা করে দুপুরের অন্ন গ্রহণ করে আবার তার বেরুবার ফন্দি। মা'র চোখ লেগে এলেই দূর্গা চড়ুই পাখির মতো সুড়ুত করে বেরিয়ে পড়ে। জঙ্গলের কোথায় কোন ফলটি পাকিবার অপেক্ষায়, তার খবর দূর্গা অপেক্ষা বেশি কেউ রাখে না।

ছোটকালে বাচ্চারা দাদি–নানি বা এই বয়েসি স্বজন–নেওটা হয়ে থাকে। এর বড় একটি কারণ বোধহয়– প্রশ্রয়। মা–বাবার বকুনি থেকে রক্ষা করতে এরা ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এদের কাছে নানা রকম আবদার করা যায়, কিসসা শোনা যায়। তাই এই শ্রেণির প্রতি শিশুদের অন্যরকম একটা মোহ তৈরি হয়। দূর্গা ও তার দূর সম্পর্কের পিসিমনিকে ভালোবাসতো। তার নিকট সন্ধ্যাকালে ছড়া শুনতো, তার গায়ের ঘ্রাণ নিয়ে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকতো।

ছোট ভাই–বোনদের প্রতি বড় বোনদের মমতা সমাজে অবিদিত নয়। দূর্গা আর তার ভাই অপুর সম্পর্ক বিশ্লেষণে আমরা অশেষ স্নেহ ভালোবাসার ঝলক দেখতে পাই। অভাবের সংসারে নিজের সাধ্যমতো ছোট ভাইয়ের স্বাদ আহ্লাদ পূর্ণ করতে খেয়ালি এই দূর্গাকেও বেশ দায়িত্বশীল রমণী মনে হয় পাঠকের। বন–বাদাড় থেকে কুড়িয়ে আনা আম ভাইকে খাওয়ানো, মমতা ভরে পাগল বলে সম্বোধন করা, পালা দেখতে যাওয়ার সময় জমানো দুটি পয়সা চুপি চুপি দেওয়া.. এরকম আরো ছোট ছোট নানা ঘটনা পাঠককে বিমোহিত করবে। নিজের শৈশব কৈশোরে ফিরিয়ে নিবে এক লহমায়।

অভাবের সংসারে কোনো লাজ থাকতে নেই, এই কথার সার্থক রূপ দেখতে পাই এই ব্রাহ্মনকন্যার মাঝে। প্রতিবেশীর গাছ তলায় একটি নারিকেল পেয়ে খুশিতে আটখানা হয়ে যায় সে। তার ঝলমলিয়ে ওঠা মুখ পাঠক যেন স্পষ্ট দেখতে পায় বইয়ের পাতায়। এমন ভাবে গল্পের সাথে একাত্ম হয়ে যাবে পাঠক। এখানেই লেখকের কেরামতি। কালো অক্ষরের খটখটে শুকনো বইয়ের পাতায়

একজন সার্থক লেখক রংধনুর সাত রং, বৃক্ষের সতেজতা, মানব চরিত্রের মমতা–হিংসা–ঘৃণা সবই জীবন্ত করে তুলতে পারেন। গায়ের কাপড়ের অযত্ন, রুক্ষ চুল, সাজগোজ সম্পর্কে চূড়ান্ত উদাসীনতার জন্য মায়ের বকুনি খাওয়া দূর্গার মাঝেও নারীর লাজুকতা দেখতে পাই নিশ্চিন্তপুরে নীরেনের আগমনের পর। নীরেনকে নিয়ে দূর্গার ভালোলাগা, বর হিসেবে নীরেনকে পাওয়ার প্রার্থনা পাঠকের নিকট একটু বাড়াবাড়ি মনে হলেও নারী মনের প্রেমময় দিকটি এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তাই অসম এই বিবাহ চিন্তায় আমরা চমকে উঠি না, আমাদের কাছে বিষয়টি অবাস্তব ঠেকে না।

উপন্যাসের দুই–তৃতীয়াংশে গিয়ে হঠাৎ করে ম্যালেরিয়ায় ভুগে গোপির প্রস্থান পাঠক হৃদয়ে যতটা করুণ সুর তোলার কথা ঠিক ততটা তোলে না। মনে হয় যেন দূর্গার মারা যাওয়া নিত্য জলখাবার গ্রহণ, স্নানাহার করা, গৃহস্থালী কাজের মতোই অতি সাধারণ একটি ঘটনা। শুধু যখন হরিহর মুখুজ্যি মেয়ের জন্য সুতি শাড়ি আর আলতাসহ বাড়ি এসে– *"ওমা দুগ্‌গা.. ও অপু"* ডাক দেয় তখন পাঠক মাত্রই বুকের কোণে গভীর বেদনা চিন চিন করে উঠে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মশাইয়ের গল্পগুলো জীবনের অতি সাধারণ আটপৌরে ঘটনাবলি আশ্রয় করেই এগিয়ে যায়। পাঠক ভেবে বিষ্ময় বোধ করে, আরে! এমন অতি সাধারণ গল্প ঘিরেও কি গল্প উপন্যাস হতে পারে। বিভূতি বাবুর রচনায় মাটি–মানুষ আর দারিদ্রতার স্বাদ এমনভাবে মিশে থাকে যে, তা পাঠকের মর্মমূলে আঘাত করে। আর পারিপার্শ্বিক মূল্যহীন মানুষগুলোকে নিয়ে ভাবতে শেখায়।

খ.

পথের পাঁচালী উপন্যাসের আরো একটি দিক হলো– দূর্গা আর অপুর শৈশব–কৈশরের দিনগুলো তিনি এমন মুনশিয়ানার সাথে বর্ণনা করেছেন যে, গ্রামে বেড়েওঠা পাঠকের বর্তমান নিমিষেই অতীতে মিশে যাবে। পাঠক বই হাতে শারীরিকভাবে বর্তমানের কোলে বসে থাকলেও তার আত্মা ঘুরবে ফিরবে নিজের শৈশব–কৈশরের দিনগুলোতে। দূর্গা আর অপুর সাথে পাঠকও আম কুড়াবে নিজের শৈশবে, ফেলনা জিনিসগুলোও খেলনা হিসেবে আগলে রাখবে পরম যত্নে।

'পথের পাঁচালী' বইটি পড়তে গিয়ে ইন্দির ঠাকরুণ চরিত্রটি আমার মনোজগতে বেশ আদ্রতা ছড়িয়েছে। কারণ এই মানুষটি জীবন কেটেছে হেলায় ফেলায়, অযত্ন–অনাহারে, অসম্মান–বঞ্চনায়। দূর্গাকে দেখে নিজের চল্লিশ বছর পূর্বে মৃত কন্যা বিশ্বেশ্বরীর স্মৃতি জীবন্ত হয়ে ওঠে, মাতৃ মমতায়

আগলে রাখেন ছয় বছরের দূর্গাকে। সান্ধ্যকালে দূর্গাকে শোনানো তার টেনে টেনে বলা ছড়া বইয়ের পৃষ্ঠা মাড়িয়ে কানে পৌঁছে যায়–

ও ললিতে চাঁপকলিতে একটা কথা শুনসে,

রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে চূড়োবাঁধা এক–মিনসে।

ইন্দির ঠাকরুণের দুখি জীবনের সাথে মিশে আছে প্রাচীন হিন্দু সমাজের এক নির্মম প্রথা– 'কুলীন বিবাহ'। জাতপাতে অন্ধ সমাজে একশ্রেণির কুলীন লোক বিয়েকে পেশা হিসেবে নিতো। কন্যার পরিবার কন্যাকে যৌতুক দিয়ে এমন বরদের কাছে আগ্রহভরে বিয়ে দিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করত। দেখা যেত, কন্যা বিয়ের পর বর দর্শন একবারই লাভ করত। কারণ স্বামী মহাশয় তো জাতের আভিজাত্যের মুলো ঝুলিয়ে দেশে দেশে বিবাহ করার মহান ব্রত পালন করে কন্যা দায়গ্রস্ত পিতাদের উদ্ধার করে চলছেন, পেছনে ফেরার সময় কোথায়! কন্যার পরিবার সমাজপ্রথা মেনে সন্তুষ্ট থাকলেও এই কন্যার জীবন নিয়ে কেউ ভাবত না।

লেখক বলেন– *"শোনা যায়, পূর্বদেশীয় এক নামজাদা কুলীনের সঙ্গে ইন্দির ঠাকরুণের বিবাহ হইয়াছিল। স্বামী বিবাহের পর কালেভদ্রে এ গ্রামে পদার্পণ করিতেন। এক–আধ রাত্রি কাটাইয়া পথের খরচ ও কৌলীন্য–সম্মান আদায় করিয়া লইয়া, খাতায় দাগ আঁকিয়া পরবর্তী নম্বরের শ্বশুরবাড়ী অভিমুখে তল্পী–বাহক সহ রওনা হইতেন, কাজেই স্বামীকে ইন্দির ঠাকরুণ ভাল করে মনে করিতেই পারে না।"*

এই বৃদ্ধার প্রতি দূর্গার মায়ের অন্যায্য আচরণ বড়ই রূঢ় হয়ে ধরা দেয়। অথচ বহু বছর পরে মানুষহীন বাড়িতে তাদের আগমনে বৃদ্ধা কতইনা খুশি হয়েছে। দূর্গার মায়ের এমন অযৌক্তিক ও নিষ্ঠুর আচরণের মধ্য দিয়ে পাঠক নারী মনস্তত্ত্বের একটি অন্ধকার দিকের ব্যাপারে সচেতন হয়ে ওঠে, নিজের আশেপাশে এমন অন্ধকারের মাত্রাতিরিক্ত চর্চা দেখে মর্মাহত হয়।

গ.

হুমায়ুন আহমেদ তার একটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ *'অনন্ত অম্বরে'* মার্কিন লেখক জন স্টেইনবেক সাহেবকে তার দেখা অন্যতম একজন মানবিক লেখক বলে মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন। কারণ এই লেখক সৃষ্ট চরিত্রগুলোকে মানবিকতার গুণে সাজিয়ে তুলতেন। আমার তো আর বিদেশি সাহিত্য সম্পর্কে জানা–শোনার দৌড় নেই, তবে বাংলা সাহিত্যেও পঠিত অংশের মধ্যে বিভূতিভূষণ

বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটু ব্যতিক্রম মনে হয়েছে। তার উপন্যাসের চরিত্রগুলো সামান্য হয়েও অসামান্য। তাদের সারল্য ও মানবিকতা বোধ অতি উচ্চমার্গের। লেখকের প্রায় প্রতিটি উপন্যাসের মূল চরিত্রটি বিনয়, ধৈর্য্য আর সততার গুণে মহিমান্বিত। আচ্ছা, একটু যাচাই করে নিই–

'একটি আদর্শ হিন্দু হোটেল' দিয়েই আমার বিভূতিভূষণ পাঠ শুরু। এই উপন্যাসে 'হাজারী ঠাকুর' বাবুর্চি চরিত্রটি কতো মহান হয়ে ধরা দিয়েছে তা অতুলনীয়। মালিক পক্ষ আর সহকর্মীদের অন্যায্য আচরণ, নিষ্পেষণ আর চুরির অপবাদ ঠাকুর মশাই কেমন হজম করে আবার তাদের শ্রদ্ধা করেছেন, তাদের দুর্দিনে তাদেরকে আশ্রয়–প্রশ্রয় দিয়েছেন। আবার এই ভালো মানুষটির পাশে কুসুম ও অতসীর মতো মানুষগুলোও কী অসাধারণ, কী অপূর্ব মানবিক গুণাবলিতে ভরপুর।

তার *'চৌধুরানী'* গল্পে আশালতা, *'পড়ে যাওয়া'* গল্পে বালক দল কী অসাধারণ মাধুর্যই নিয়েই না বিরাজ করছে। *'হিঙের কচুরি'*তে একটি বাচ্চা ছেলের প্রতি পতিতা পাড়ার বাসিন্দা কুসুমের নিখাদ ভালোবাসা হৃদয় ছুঁয়ে যায়। পাঠকের কাছে তখন কুসুম ও প্রভা চরিত্রগুলোর পতিতা চরিত্র ছাপিয়ে মমতাময়ী নারী চরিত্র প্রধান হয়ে ওঠে। এখানেই লেখকের মুনশিয়ানা, তিনি পতিতা পাড়ায়ও মানবিকগুণের ফুল ফুটিয়েছেন।

আবার *'সুন্দরবনে সাত বছর'* উপন্যাসে দস্যু সরদার পুত্র মনুর আন্তরিকতা, অপরিচিত এক মহিলার মাতৃস্নেহ, মুসলিম জেলে সর্দারের সহায়তা, নির্জন দ্বীপের বৃদ্ধ দাদুর নির্লোভ ও দরবেশী জীবন যাপন.. সব কিছুতেই 'সবার উপরে মানুষ সত্যের' জয় জয়কার।

তাই বলি, আমরা জন স্টেইনবেককে না চিনি, সমস্যা নেই। তবে আমাদের বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানা উচিং, পড়া উচিৎ।

***** বাংলা সাহিত্যের অন্যতম লেখক বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের তুমুল পাঠক নন্দিত বই 'পথের পাঁচালী' নিয়ে লিখেছেন মাসুম বিল্লাহ আরিফ। প্রেক্ষা তার মস্তিষ্কপ্রসূত সন্তান এবং বর্তমানে তিনি এর সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করছেন।***

রূপান্তর

নাফিস সাদেকীন

গ্রেগর সামসা একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠামাত্র আবিষ্কার করলো সে একটা বৃহদাকার পোকাতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। নিজের ঘরের সবকিছু পরখ করে দেখে গ্রেগর বুঝতে পারলো সে কোনো ঘুমের ঘোরে নেই। আবার এটা কোনো স্বপ্নও নয়; একেবারে শতভাগ বাস্তব। নতুন শরীরটাকে গ্রেগর ধীরে ধীরে বুঝে ওঠার চেষ্টা করে। একাধিক পা, পিঠের নিচে বড় শক্ত খোলস, নতুন মুখ, মাথা সবকিছুর মধ্যে সে নিজেকে মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা করতে লাগলো। সে বুঝতে পারে যে অনেক বেলা হয়েছে; এবার তাকে অফিসের দিকে ছুটতে হবে। কিন্তু নতুন শরীরের সাথে খাপ খাইয়ে সে কোনোভাবেই ঠিকঠাক চলাফেরা করতে পারছিলো না, এমনকি উঠে দাঁড়াতেই পারছিলো না।

এদিকে সকালের নাস্তার টেবিলে আজ গ্রেগরকে অনুপস্থিত দেখে তার পরিবারের সবাই কিছুটা হলেও চিন্তিত হয়ে পড়ে আর অন্যদিকে গ্রেগর আজ অফিসে যায়নি বলে খোঁজ নিতে একেবারে বাড়ি চলে আসেন অফিসের ম্যানেজার সাহেব। গ্রেগরের কী হয়েছে সেটা বের করতে ম্যানেজার সাহেব ও গ্রেগরের পরিবারের সকল সদস্য (বাবা, মা, বোন) উপরে তার শোবার ঘরে উঠে আসে এবং পরক্ষণেই গ্রেগর সামসাকে একটা আস্ত বৃহদাকার পোকা হিসেবে আবিষ্কার করে।

পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষটার নব্য এই রূপ তাদের – পরিবারের সদস্যদের – জীবনে ধোঁয়াশার সৃষ্টি করে। এমন একটা পরিস্থিতিতে কেমন আচরণ করতে হবে সেটাই তারা ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারে না। তারা গ্রেগরের নতুন রূপকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিল না। ফলস্বরূপ, যে মানুষটা তাদের জন্য এতোদিন ভাগ্যলক্ষ্মী ছিলো তার প্রতি তারা বৈষম্যমূলক আচরণ করতে শুরু করে। গ্রেগরও বুঝতে পারে কোনোকিছুই আর আগের মতো নেই। ভেতরে সে পূর্বের গ্রেগর সামসা হতে পারে, তবে বাহিরে সবার চোখে সে একটা পোকা ছাড়া অন্য কিছু নয়। আত্মীয়স্বজনদের পালা করে তাদের বাড়িতে জড়ো হওয়া, নানারকম আলাপচারিতা সবকিছুই গ্রেগরের কানে পৌঁছায়। সে বুঝতে পারে যারা তার জীবনে কোনো ভূমিকা রাখেনি তারাও আজ তার পরিস্থিতিতে দেখে অবহেলার সুরে সুর মেলাচ্ছে। মা, বাবা, বোন থেকে শুরু করে বাড়ির কাজের লোকটার জন্যও সে এখন এক প্রকার বোঝা আর অবহেলার বস্তু। বাড়ির কাজের মহিলাটা যেন এই ঘরে কাজ না করতে

পারলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। এদিকে তার বোন 'গ্রিট সামসা' যাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে গ্রেগরের খাবার–দাবার, ঘর পরিষ্কারের বিষয়গুলো তত্ত্বাবধান করতে, সে–ও তার কাজের প্রতি একসময় চরম অনীহা অনুভব করতে থাকে। এ যেন অনেকটা 'করার আছে তাই করছি' রকমের অবস্থা। একটা সময়ে গিয়ে ঘরের যত অপ্রয়োজনীয়–অব্যবহৃত–পুরোনো জিনিসপাতি রয়েছে সবকিছুই গ্রেগরের সেই শোবার ঘরে স্থান পেতে থাকে। পরিবারের সদস্যদের অবহেলা, ঘৃণা, অনাগ্রহ সবকিছুই গ্রেগরের চোখে পরিষ্কারভাবে ধরা দেয় এবং মুখোশের আড়ালে স্বজনদের বিকৃত রূপ ক্রমশ তাকে হতভম্ব করে।

বিশ্বখ্যাত লেখক, গল্পকার, দার্শনিক ফ্রাঞ্জ কাফকার লেখা ছোট উপন্যাস বা নভেলা *'দ্যা মেটামরফোসিস'* হলো কাফকার অমর সৃষ্টিগুলোর একটি। কাফকার লেখা বাস্তবতা আর কল্পনার দারুণ সংমিশ্রণ বলা চলে। কাফকা তার তৈরি করা চরিত্রগুলোর মাঝে একপ্রকার পরাবাস্তবিক সংকট সৃষ্টি করার জন্য সব মহলেই সমাদৃত। *'দ্যা মেটামরফোসিস'* কাফকার সিগনেচার স্টাইল 'থার্ডপার্সন ইনডিরেক্ট ন্যারেটিভ' স্টাইলে লেখা। গল্পের শুরুতেই বলা হয়েছে গ্রেগর সামসা সকালে উঠে দেখলো সে একটা বৃহদাকার পোকা হয়ে গিয়েছে তবে কোথাও তার পোকা হয়ে যাওয়ার পেছনে কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হয়নি। কাফকার বেশিরভাগ লেখার ধরণে অমনটা চোখে পড়ে। কেন্দ্রীয় চরিত্রের কষ্টের পেছনে বা ভোগান্তির পেছনে কারণটা ব্যাখ্যা না করে সরাসরি তাদের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে গল্প শুরু হয়। গ্রেগর চরিত্রের মধ্যে এমন একজন মানুষের প্রতিচ্ছবি উঠে আসে যে কিনা শত কষ্টের মাঝেও পরিবারের মানুষগুলোর কথা ভেবে চলে।

নিজের স্বপ্ন ইচ্ছা আশা আকাঙ্ক্ষা সব বিসর্জন দিয়ে পরিবারের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেয়া একজন মানুষ গ্রেগর। নিজেকে পোকা হিসেবে আবিষ্কার করার পরেও গ্রেগর ভাবতে থাকে কিভাবে আজ সে অফিস করতে যাবে; তার মাথায় একবারো এটা খেলে না যে, সে আর তার আগের রূপে নেই এবং মানুষজন তাকে স্বাভাবিকভাবে নিতে পারবে না।

গ্রেগরের এমন চিন্তাভাবনা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের যান্ত্রিকতার প্রতীক হিসেবে দাঁড়ায়, যে যান্ত্রিকতার বেড়াজাল থেকে আমরা চাইলেও বের হয়ে আসতে পারি না। আমাদের জীবনে হয়তো ঝড়ঝাঞ্চা চলছে, সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে, তাও জীবনের নিয়মে আমাদের অনবরত ছুটে চলতে হয়। চাকুরি, কাজ, আর্থিক মুক্তিলাভের যে চক্র একবার শুরু হয়, সেটা থেকে আমরা চাইলেও আর বের হতে পারি না। একটা সময়ে গিয়ে যখন গ্রেগরের ঘর থেকে সব দরকারি জিনিসপাতি সরিয়ে সব নোংরা জিনিস দিয়ে তার ঘর ভর্তি করা হয়, তখন এটাই পরিলক্ষিত হয় যে, পরিবারের সকলে তার উপর থেকে হাল ছেড়ে দিয়েছে।

উপন্যাসের শেষে এসে দেখা যায় গ্রেগরের চূড়ান্ত পরিণতি তাদের জন্য অনেকটা মুক্তিলাভের মতো হয়ে দাঁড়ায়। পরিবারের ভাগ্যলক্ষ্মী যে রাতারাতি সেই পরিবারটির জন্য চরম দুর্ভাগ্যের কারণ হতে পারে সেটা আমাদের পারিবারিক জীবনের স্বার্থপরতার প্রতিনিধিত্ব করে।

আরো একটা ব্যাপার হলো– পোকা হয়ে যাওয়ার পর থেকে গ্রেগরের একাকীত্বের জীবন শুরু হয়। যখন সে তার অফিস–কাজ–পরিবারের দিকে ফিরে তাকায় তখন সে লক্ষ্য করে কি ভয়ানক দায়বদ্ধতার স্বীকার হয়ে তাকে তার অপছন্দের কাজের পেছনেও ছুটতে হয়েছে। পরিবারের সকল দায়িত্ব সে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলো। ছোট বোনটা যাতে ভালোমতো বেহালা শিখতে পারে সেই বন্দোবস্তও করে রাখে গ্রেগর। সেই ছোটবোনই তাকে খাবার দেয়ার সময়, তার ঘর পরিষ্কার করার সময় দিনে দিনে অবহেলার মাত্রা বাড়াতে থাকে।

গ্রেগর বুঝতে পারে মেটামরফোসিস বা রূপান্তর শুধু তার হয়নি বরং তার পরিবারের প্রতিটা সদস্যের মধ্যেই হয়েছে। গ্রেগরের বাহ্যিক পরিবর্তন এসেছে তবে এই একই সময়ে তার পরিবারের লোকেদের মধ্যে একটা অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটে গেছে ফলস্বরূপ তারা আর আগের মানুষগুলো নেই। গ্রেগরের বাবা যে কিনা একসময় চলাফেরা করতে পারত না সেও আজ বাহিরে গিয়ে রুটি রোজগারের ব্যবস্থা করছে, গ্রেগরকে অপরাধীর চোখে দেখছে। প্রথম প্রথম তার মা সন্তানের প্রতি মায়া দেখালেও তিনি একটা সময়ের পরে যেন সবকিছু থেকে হাঁপ ছেড়ে নিজেকে বাঁচাতে চান। ১৭ বছর আদরের ছোট বোনটার মাঝে ধীরে ধীরে স্বাধীনচেতা এক ব্যক্তিসত্তা জন্ম নিচ্ছে। সে বালিকা থেকে নারী হয়ে উঠছে এবং আদুরে ছোট বোন থেকে ক্রমশই দয়ামায়াহীন পাথুরে একটা সত্তায় পরিণত হচ্ছে।

'দ্যা মেটামরফোসিস' এর মূল শিক্ষাটা ঠিক এখানেই। মেটামরফোসিস আমাদের সকলের মধ্যে ঘটে থাকে। আমরা কাউকে পরিবর্তিত হতে দেখে, অন্যরকম হতে দেখে ভাবি তারা পরিবর্তন হয়ে গেছে তবে আমরা কখনোই এটা বুঝে উঠতে পারি না যে আমরা নিজেরাও আর আগের মানুষ নেই। প্রকৃতপক্ষে, যারা আমাদের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে দেয়, আমরা খুব দ্রুত তাদের কৃতকাজের কথা ভুলে যাই। ব্যক্তিস্বার্থের সামান্য ব্যাঘাত ঘটলেই আমরা কাউকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে দ্বিধাবোধ করি না।

যদি আমরা আমাদের ব্যক্তি কিংবা সামাজিক জীবনে দৃষ্টিপাত করি তবে আমাদের চোখে অবশ্যই ধরা দিবে যে, আমরা নিজেরা যেমন অন্যদের সাথে এমন বৈষম্য করি, তেমন আমরা নিজেরাও এমন বৈষম্যের শিকার হই। আমাদের পারিবারিক, সামাজিক জীবনে বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে এমন আচরণটা

করা হয়। তাদের বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসা হয় অথচ জীবনের ক্রান্তিলগ্নে তাদের শুধু দরকার আপনজনের সামান্য নৈকট্য। পরিবারে উপার্জনক্ষম মানুষটা যখন চাকরি হারায় বা আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়, তখন তার প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিও রাতারাতি বদলে যায়। বস্তুত, পরিস্থিতির পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে রূপান্তর কখনো শুধু একজন নির্দিষ্ট মানুষের মাঝে ঘটে না, তার রূপান্তরের সাথে সাথে চারপাশের মানুষেরও রূপান্তর ঘটে।

*** বিখ্যাত লেখক ফ্রাঞ্জ কাফকার তুমুল পরিচিত উপন্যাস 'দ্যা মেটামরফোসিস'। নামটা যেমন অদ্ভুত, বইয়ের বিষয়বস্তুও তাই। বইটি নিয়ে লিখেছেন নাফিস সাদেকীন। তিনি চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী।*

নীলগঞ্জ গ্রাম

নাইমা সুলতানা

হুমায়ুন আহমেদের '১৯৭১' উপন্যাসটি মহান মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক উপন্যাস। এ উপন্যাসের পটভূমি হিসাবে লেখক বেছে নিয়েছেন নীলগঞ্জ নামের বিচ্ছিন্ন একটি ছোট্ট গ্রাম; যা ময়মনসিংহ-ভৈরব লাইনের ছোট স্টেশন থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত। যাওয়ার একমাত্র বাহন রিকশা। তাও গ্রীষ্মকালে, বর্ষাকালে কাদা মাড়িয়ে পায়ে হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। গ্রামের লোকজনও ছিল বেশ সাধারণ।

তৎকালীন জীবনের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন এমন এক নির্জন গ্রাম কেন বেছে নিলেন লেখক– এমন প্রশ্ন মনে জাগাটা স্বাভাবিক। আলোচ্য উপন্যাসে লেখকের মূল আগ্রহ ছিল– গ্রামে মিলিটারি আগমনের ফলে গ্রামের সহজসরল মানুষগুলোর মনোজাগতিক কম্পন পাঠকের সামনে তুলে ধরা।

'১৯৭১' উপন্যাসে বেশ কিছু চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। উপন্যাসটি যদিও অন্ধ বুড়ো মীর আলি এবং এবং তার পুত্র ব্যবসায়ী বদিউজ্জামানের গল্প দিয়ে শুরু হয় কিন্তু মূল প্রেক্ষাপটে তাদের কোনো আবেদন নেই। তাদেরকে মূলত পাঠকের মনোযোগ ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করতেই গল্পের শুরুতে আনা হয়েছে।

গ্রামবাসীদের মধ্যে আরো দুটি চরিত্র উপন্যাসের বড় একটি জায়গা জুড়ে ছিল– নীলগঞ্জ স্কুলের শিক্ষক আজিজ মাস্টার এবং মসজিদের ইমাম সাহেব; যাদের গ্রামবাসী বিদেশি বলে ডাকত।

মিলিটারি গ্রামে প্রবেশ করেই তাদেরকে আটক করে এবং মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। লেখক দৃশ্যকল্পের মাধ্যমে পাক–মিলিটারির জিজ্ঞাসাবাদের ধরণ তুলে ধরতে চেয়েছেন। জিজ্ঞাসাবাদের সময় যে আতঙ্ক এবং জীবননাশের আশঙ্কা মানুষ অনুভব করত, তা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এই উপন্যাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি চরিত্র হলো– মেজর এজাজ আহমেদ এবং তার সহযোগী রফিক।

“বুক পর্যন্ত পানিতে ডুবে লালচে আগুনের আঁচে যে রফিক দাঁড়িয়ে আছে, মেজর এজাজ তাকে চিনতে পারলেন না। এ অন্য রফিক। মেজর এজাজের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে লাগল।” –বইয়ের শেষ তিনটি লাইনে যুদ্ধরত বাঙালিদের এক অদ্ভুত রূপ ফুটে উঠেছে। যা দেখে হানাদার পিশাচদের গায়ের পশম সরসর করে দাঁড়িয়ে যায়।

***** বাংলা সাহিত্যের বরপুত্র হুমায়ুন আহমেদ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিকউপন্যাস লিখেছেন বেশ কয়েকটি। ‘১৯৭১’ তার মধ্যে একটি। প্রেক্ষার এই সংখ্যায় উপন্যাসটি নিয়ে লিখেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নাইমা সুলতানা।***

ভিন্ন স্বাদের আলাপ

মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান

বেশ আগ্রহ নিয়া পিনাকী ভট্টাচার্যের *'মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম'* বইটা বেশ কিছুদিন পূর্বে নেওয়া হইলেও পড়ি পড়ি বলে পড়া হয় নাই। অবশেষে গত সপ্তাহে এক দিনেই বইখানা পড়ে শেষ করলাম। পড়ার পর মনে হইলো, *"মুক্তিযুদ্ধের নির্মাণ ও পরিচালনায় ইসলাম ছিলো প্রাধান্য বিস্তারকারী বয়ান"* এইরকম যুক্তি বইয়ের শুরুতে দিলেও আদতে বইয়ের কোনখানেই তার ছাপ আমার চোখে পড়ে নাই। যেইসব যুক্তি আর দলিল নিয়া তিনি হাজির হয়েছেন ওসব জিনিসরে মুক্তিযুদ্ধের পরিচালনায় কোর্ কনসেপ্ট বইলা মাইনা নেওনের মত আহামরি কিছু আমি পাই নাই। শিরোনাম এবং প্রত্যাশা অনুযায়ী খুব শক্ত বয়ান চোখে পড়ে নাই বইলা কিছুটা হতাশও হয়েছি বলা যায়। তয় মুক্তিযুদ্ধে ইসলামকে প্রাধান্য বিস্তারকারী বয়ান হিসেবে দেখাইতে না পারার মধ্যেও স্পেসিফিক একটা জরুরী আলাপ লেখক এই বইয়ের মধ্য দিয়ে শুরু করেছেন। যেই আলাপটা ইতিহাস পাঠের লাইগা খুব জরুরী ছিল।

এতকাল মুক্তিযুদ্ধ ও ইসলামকে ঘরের শত্রু বিভীষণ হিসেবে উপস্থাপনের যেই আলাপ বঙ্গদেশে জারি ছিলো, তার কাউন্টারে একটা নয়া আলাপ লেখক বইটিতে এভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, ইসলাম ও মুক্তিযুদ্ধ মোটেই বৈরী ধারণা হিসেবে একাত্তরে কাজ করে নাই। বরং মুক্তিযুদ্ধ ও ইসলাম সহায়ক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলো একাত্তরে। মুক্তিযুদ্ধকে ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই বলে যে প্রোপাগান্ডা একাত্তরে পাকিস্তানিরা হাজির করেছিলো, তা জনগণ খুব একটা খায় নাই। আর তাদের এই প্রোপাগান্ডার জবাবে, মুক্তিযোদ্ধারা তাদের প্রচার প্রচারণায় ইসলামের প্রতি একনিষ্ঠ সমর্থন, শ্রদ্ধা, আন্তরিকতা ও বিরোধ না থাকার বিষয়টি বরং অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে স্পষ্ট করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধের আগে পরে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের নীতি নির্ধারণী দলিল, বক্তব্য ও কর্মসূচিতে ইসলাম কিভাবে হাজির ছিলো এই আলাপটা বইয়ের সবচেয়ে বড় প্লাস পয়েন্ট বলে মনে হয়েছে। কারণ, আওয়ামীলীগকে দিয়েই একজন লেখক বা গবেষককে মুক্তিযুদ্ধের তৎকালীন অবস্থান তুলে ধরতে হবে। অন্য আলাপ এইখানে টিকবে না। এছাড়া স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রচারিত অনুষ্ঠান, মুক্তিযুদ্ধকালীন আওয়ামীলীগের মুখপত্র জয়বাংলার বিষয়াবলী, রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের চিঠিপত্রে ইসলামি ভাব–প্রভাব এই আলাপকে মোটামুটি সামনে নিয়ে এসেছে

আমরা মানি আর না মানি এটাই সত্যি যে, বাংলাদেশ তো বটেই ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম সবসময় একটা বিগ ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছে। বাংলাদেশের জনগণের বড় একটা অংশ এখনো ইসলামকে সবকিছুর উর্ধ্বে রাখেন। প্র্যাকটিসিং মুসলিমের নগণ্য সংখ্যা দিয়ে আপনি এই উপমহাদেশের ইসলামের আলাপকে সামনে আগাই নিতে পারবেন না। জুময়ার নামাজ না পড়া লোকটাও নবীর কটুক্তির প্রতিবাদে রাজপথের মিছিলে দেখবেন গলা ফাটায়। তাই এই পুরো জনগোষ্ঠীকে সামনে নিয়াই আপনাকে ইসলামের আলাপটা বুঝতে হবে। আবার একইসাথে আপনি মুক্তিযুদ্ধ তথা বাংলাদেশের জন্মের যে শিকড় তা নিয়া আপস–মীমাংসা কইরাও সামনে আগাইতে পারবেন না। তাই মুক্তিযুদ্ধের মত বিষয়ে যখন আপনি ইসলামকে কাউন্টার হিসেবে উপস্থাপন করবেন – যেটা এতদিন হয়ে আসছে – তখন দেশের বড় একটা অংশ মানুষ স্বাভাবিকভাবেই এই আলাপে বিভক্ত হয়ে যায়।

এইরকম দুইটা সেনসিটিভ বিষয়ে যে স্বাধীনতার এতকাল পরে এসে কেউ আলাপ তুললো তার জন্য হলেও পিনাকী ভট্টাচার্য লেটার মার্কস পাবেন। এই আলাপ তোলাটা ইতিহাসের জন্য, জাতীয় সম্প্রীতির জন্য, ভেদাভেদের রাজনীতিতে কুঠারাঘাত করার জন্য খুব বেশি জরুরী ছিল। মুক্তিযুদ্ধ এবং ইসলামকে অপজিশন হিসেবে দেখানোর যে বয়ান এতদিন জারি ছিল তার কাউন্টারে এই বই জনমনে ভীষণ ধাক্কা হিসেবে কাজ করবে।

মুক্তিযুদ্ধে দেশের আলেম সমাজের ভূমিকা নিয়া যেই আলাপ লেখক তুলেছেন; এইটারে আমার কাছে বইয়ের সবচেয়ে বেশি দুর্বল আলাপ মনে হয়েছে। এইখানে জমিয়তে উলামার বাইরে বলার মত কারো ভূমিকা চোখে পড়েনাই। আরেকটা আলাপ অবশ্য তোলাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে মনে হয়েছে। একাত্তরে কারা রাজাকার ছিল? এ আলাপটা এত সংক্ষেপে না শেষ করে আরেকটু দীর্ঘ করলে পাঠকের সুবিধে হইতো। এইক্ষেত্রে আফসান চৌধুরীর আলাপকে আমার বেশ প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে। যেখানে তিনি দেখান রাজাকারদের একটা বড় অংশ ছিল গ্রাম্য মাতব্বর এবং সমাজের দুর্বল শ্রেণি পেশার মানুষ। লেখক তার বক্তব্যের গ্রাউন্ড অধিকতর মজবুত করার লাইগা সেই আলাপের সাহায্য নিতে পারতেন।

গৌতম দাসের আলাপটাও বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে। যেইখানে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হইলো এবং মুক্তিযুদ্ধে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লো সেইখানে দেশ স্বাধীন হবার পর সেক্যুলারিজমের বয়ান আসলো কোত্থেকে? তবে এই আলাপটাও বেশ তাড়াহুড়া করে শেষ করা হয়েছে বলে মনে হয়েছে আমার কাছে। বিশেষত কিভাবে এই আলাপের সাথে ভারত সরকারের তৎকালীন অবস্থান ও ভূমিকার জায়গাটা সম্পৃক্ত তা বিশদভাবে

আলোচনার দাবি রাখে। পড়ার সময় আমার কাছে মনে হয়েছে, পুরো বইতেই লেখক একটা অস্থিরতার মধ্য দিয়ে গেছেন। মুক্তিযুদ্ধে ইসলামকে প্রাধান্য বিস্তারকারী বয়ান হিসেবে দেখাইতে চাওয়ার যে আলাপ তিনি তুলেছেন, সেইখানে ব্যর্থ হইলেও মুক্তিযুদ্ধ এবং ইসলাম যে একে অপরের শত্রু নয় এই বয়ানে নিঃসন্দেহে লেখক সফল। এইক্ষেত্রে যেই বয়ান তিনি শুরু করেছেন তারে সামনে আগাই নেওয়ার লাইগা নতুন আলাপ শুরু করাটা এখন ইতিহাসের দাবি।

*** নৃবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর আবদুল মান্নান একজন নবীন গবেষক। বিভিন্ন বই নিয়ে একজন পাঠক হিসেবে তার বিশ্লেষণ মুগ্ধ হওয়ার মতো। প্রেক্ষার চলতি সংখ্যায় তিনি লিখেছেন পিনাকী ভট্টাচার্যের বই 'মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম' নিয়ে।*

লাখো তরুণের স্বপ্ন জয়ের শক্তি

নবাব আব্দুর রহিম

ওসমানীয় সাম্রাজ্যের ইতিহাসভিত্তিক সিরিয়ালগুলোতে প্রায়শই একটি কথা শুনি, *"রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তরবারির ছায়ায়, গাজীদের প্রচেষ্টায়। কিন্তু এটি জ্ঞানের আলো নিয়ে আলেমদের কাঁধে ভর করে বেঁচে থাকে।"* এর সরল অনুবাদ হতে পারে আমাদের চিরচেনা সেই প্রবাদ– 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড।' আমেরিকা প্রবাসী গবেষক রউফুল আলম তাঁর *'একটা দেশ যেভাবে দাঁড়ায়'* গ্রন্থে লিখেছেন, *"একটা দেশকে দাঁড় করাতে হলে আগে মানুষদের আলোকিত করতে হয়। আর মানুষকে আলোকিত করার প্রধানতম শর্ত হলো সুশিক্ষা।"*

তাহলে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে আরেকবার ভেবে দেখা উচিত। সেই মেরুদণ্ড ঠিক আছে তো? এক্ষেত্রে রউফুল আলমের গ্রন্থটি স্বচ্ছ দর্পণের মত বাংলাদেশের শিক্ষা–সংকট তুলে ধরবে আপনার কাছে। একইসঙ্গে উত্তরণের পথও বাতলে দেবে গ্রন্থটি; যা লাখো তরুণের স্বপ্নজয়ের শক্তি হবে। দেশের বাইরে শিক্ষা ও গবেষণার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত থাকায় বাংলাদেশের শিক্ষার সংকট নিরূপণ করতে সক্ষম হয়েছেন এই প্রত্যয়ী গবেষক। তাঁরই ছাপ রয়েছে *'একটা দেশ যেভাবে দাঁড়ায়'* গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠায়। বইটি মূলত প্রথম আলোসহ বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত লেখকের অণুপ্রবন্ধসমূহের সংকলন।

গ্রন্থটিতে প্রবন্ধগুলো সুবিন্যস্ত না হলেও এর বিষয়বস্তুকে মোটাদাগে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়–

১. শিক্ষার সংকট ও সমস্যা

২. উত্তরণের পথ

দেশজুড়ে শিক্ষার সংকট ও সমস্যা

মানুষের এগিয়ে যেতে যেমন লক্ষ্য, দৃঢ় সংকল্প ও সুস্পষ্ট পরিকল্পনা প্রয়োজন; তেমনই প্রয়োজন লক্ষ্যের পথে সংকটগুলো চিহ্নিত করা। শিক্ষা যদি জাতির মেরুদণ্ড হয়ে থাকে তাহলে লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে এই মেরুদণ্ড কতটুকু সহযোগিতা করছে কিংবা বাঁকা হয়ে গিয়েছে কিনা সেটা যাচাই করা খুবই প্রয়োজন।

'একটা দেশ যেভাবে দাঁড়ায়' গ্রন্থে মোট ৬৩টি অণুপ্রবন্ধ রয়েছে। সুখপাঠ্য এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধগুলোর অধিকাংশেই বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যাগুলো চিহ্নিত হয়েছে। গ্রন্থে আলোচিত সমস্যাগুলো থেকে সামান্য কিছু বিষয় এখানে উল্লেখ করা হলো।

লেখক 'বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দীর্ঘশ্বাসটুকু শুনুন' শীর্ষক প্রবন্ধে শিক্ষার্থীদের অবহেলা–উপেক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সংগ্রামের বর্ণনা দিয়ে তিনি লিখেছেন, *"এত সংগ্রামের পরও তাঁরা ইউনিভার্সিটিতে পড়তে আসেন। বড় বড় স্বপ্ন দেখেন। আর যখনই ইউনিভার্সিটি থেকে বের হন, তখন তাঁদের হাতে শুধু একটি সনদ ধরিয়ে দেওয়া হয়। না কোনো গবেষণার অভিজ্ঞতা, না কোনো প্রফেশনাল জীবনের সঠিক পদ্ধতি! উপরন্তু জীবন থেকে কেড়ে নেওয়া হয় কিছু সময়। আমরা এর নাম দিয়েছি 'সেশনজট'।"*

আমাদের এতটুকু সমস্যাই যেন পর্যাপ্ত নয়। একই প্রবন্ধে লেখক আফসোস করে বলছেন, *"যখন দেখি, ইউজিসির একজন চেয়ারম্যান রাজনৈতিক দলের গুণগান গেয়ে লেখার সময় পান, অথচ দেশের হাজার হাজার তরুণ-তরুণীর ভবিষ্যৎ নিয়ে বলেন না, লেখেন না, তখন খুব কষ্ট হয়।"*

'একটা দেশ যেভাবে দাঁড়ায়' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, *"আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সন্ধ্যার পর ভুতুড়ে হয়ে থাকে। বছরের এক-তৃতীয়াংশ সময় বন্ধ থাকে। প্রচুর সরকারি ছুটি থাকে। সঙ্গে হরতাল, মারামারি-ধরাধরি, ধর্মঘট, অবরোধ, আন্দোলন, ভিসি হটানোর জন্য ক্লাস বর্জন। তার সঙ্গে নগরডুবি, যানজট। বেশির ভাগ ইউনিভার্সিটিতে নেই আধুনিক ল্যাব। আছেন গবেষণার অভিজ্ঞতাহীন শিক্ষক! আছে শিক্ষকের অপ্রতুলতা। তাহলে মেধাবী ও কর্মপাগল মানুষ তৈরি হবে কী করে? তদুপরি আছে শিক্ষার্থীদের আর্থিক টানাপোড়ন।"*

'দেশটা যেভাবে হেরে যায়' শীর্ষক প্রবন্ধে শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতিতে অনিয়ম, 'দয়া করে ওদের ঠকাবেন না' শীর্ষক প্রবন্ধে শিক্ষকদের পাঠদানে অনীহা, শিক্ষক–রাজনীতি ও মানহীন গবেষণা, 'প্যারালাইজড মাইন্ড' প্রবন্ধে শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকদের রূঢ় আচরণসহ শিক্ষার অন্তরায় আরও অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন লেখক।

পৃথিবীর সর্বত্রই ২৫ থেকে ২৬ বছর বয়সের তরুণেরা পিএইচডি সম্পন্ন করে। কিন্তু আমরা পিএইচডির চিন্তা করি চল্লিশের ঘরে গিয়ে। কারণ কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকরাই ছাত্রছাত্রীদের গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করে না। শুধু তাই নয়, খোদ শিক্ষকরাই গবেষণাহীন, চৌর্যবৃত্তির সঙ্গে জড়িত!

এভাবেই গ্রন্থটির প্রতি পরতে পরতে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সংকট নিয়ে আলোচনা করেছেন লেখক রউফুল আলম। জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষার্থীদের প্রতি নিদারুণ অবহেলা ও উদাসীনতা উদঘাটন করছেন। দেশ যেভাবে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে, দরদী হৃদয়ের আবেগ দিয়ে দিয়েছেন তার বার্তা। পাশাপাশি এর থেকে উত্তরণের দিকনির্দেশনাও দিয়েছেন।

উত্তরণের পথ

সংকট থেকে উত্তরণের জন্য পৃথক কোন প্রবন্ধ গ্রন্থটিতে নেই। তবে প্রতিটি সংকটের সঙ্গে সঙ্গেই তার থেকে উত্তরণের সন্ধান অথবা ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। এর মধ্যে বিভিন্ন দেশের উদাহরণ বেশ অর্থবহ। গ্রন্থটির অনেক প্রবন্ধেই বিভিন্ন দেশের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া চীন, আমেরিকা, ইরান, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত, জাপান ও সিঙ্গাপুর নিয়ে পৃথক পৃথক প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে গ্রন্থটিতে।

বইটি পড়লে হয়তো আপনি হতাশ হতে পারেন। পাঠকদের অনেকেরই এমন অভিজ্ঞতা হতে পারে। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে এই গ্রন্থ পাঠককে হতাশায় আচ্ছন্ন করার পরপরই একটি অনিবার্য বিপ্লবের জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ করে তুলবে।

এজন্য বইটির অনেক জায়গায় লেখক অন্তরালের নায়কদের বর্ণনা দিয়েছেন। লিখেছেন দুনিয়া কাঁপানো স্থপতি ফজলুর রহমান খান, গবেষক জাহিদ হাসান, নাসায় কাজ করা বাংলাদেশি বিজ্ঞানী রুবাব খান, আব্দুস সাত্তার খানসহ কীর্তিমান বাঙালিদের বিশ্বজয়ের গল্প।

***** চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও সাংবাদিক নবাব আবদুর রহীম একজন পড়ুয়া মানুষ। প্রেক্ষার এই আয়োজনে তিনি লিখেছেন গবেষক রউফুল আলমের 'একটা দেশ যেভাবে দাঁড়ায়' বইটি নিয়ে।***

অনন্য কিছু একটা পড়লাম আমি

মাহবুব এ রহমান

'ওঙ্কার' একটা ছোট্ট কলেবরের উপন্যাস। উপন্যাসের মূল প্রেক্ষাপটটা মুক্তিযুদ্ধ পূর্বের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৬ দফা আন্দোলন এবং গণঅভ্যুত্থান সময়ের চিত্রটাকে ধারণ করেই। যখন এদেশে আইয়ুব খানের শাসন বিরাজমান ছিল। কিন্তু লেখক উত্তম পুরুষের জবানিতে একটা প্রেক্ষাপটের সাথে কতগুলো বিষয়ের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন যা আসলেই আশ্চর্য হওয়ার মতো। পাশাপাশি উপন্যাসের মাত্র একটা চরিত্রের নামের সাথে লেখক পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন সেটা কেমন অদ্ভুত লেগেছে আমার কাছে। উপন্যাসের শুরু থেকেই সামাজিক বিষয়াবলীর প্রাধান্য থাকলেও পরতে পরতে ছিল সে সময়ের রাজনৈতিক অবস্থার চিত্র। তিনি সে সময়ের চিত্র আঁকতে লিখেছেন, "মানুষের চোখে আগুন, বুকে জ্বালা, কণ্ঠে আওয়াজ, হাতে লাঠি, রৌদ্রোজ্জ্বল দুপুরে স্লোগানের ধ্বনি বাংলাদেশের আকাশমণ্ডলে কোটি কোটি বর্শাফলার মতো ঝিকিমিকি খেলা করে।" বলা যায় ইতিহাসের কোলে মাথা রেখে রাজনৈতিক রঙচঙে এগিয়েছে উপন্যাসটি।

কম শব্দব্যায়ে যে বেশি কিছু বলা যায় তা করে দেখিয়েছেন আহমদ ছফা। শরতের শুভ্র কাশফুলের নির্মল ঢেউয়ের ছন্দের মতো কিংবা ঝর্ণার অবিরাম স্রোতধারার মতো লেখকের বর্ণনাভঙ্গি হৃদয় কেড়েছে আমার। এই উপন্যাসে লেখক মানুষের না পাওয়ার কিংবা না পারার অক্ষমতার আকুলতা চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। উপন্যাসে ছফা বাক্যে বাক্যে যে উপমা ও উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার করেছেন তা দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না।

প্রথমেই লেখক কথকের বাবা এবং আবুনসর মোক্তার সাহেবের মাধ্যমে সেই সমাজের নিরেট বাস্তব একটা চিত্র এঁকেছেন। যা পাঠ মাত্রই অনুমেয়।

আমাদের জীবনে প্রচুর পটপরিবর্তন হয়। একটা সময় যে ব্যক্তিকে কিংবা যে কাজটাকে আমরা অপছন্দ করতাম সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সেই কাজটাকেই কিংবা সেই ব্যক্তিটাকে দ্বিগুণভাবে গ্রহণ করে ফেলি। ভালোবেসে ফেলি। সময়ের পরিবর্তনের সাথে বদলে যায় আমাদের চিন্তা ও চেতনা। যার বাস্তব উদাহরণ লেখক এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন।

আমরা একটু খেয়াল করলে দেখবো গল্প কথককে আবুনসর মোক্তার সাহেবের যে বোবা মেয়েকে একান্ত বাধ্য হয়ে বিয়ে করতে হয়েছে একটা সময়ে তাকেই কিন্তু প্রচণ্ড ভালোবেসে ফেলেছেন। কথক

প্রথমে বোবা স্ত্রীকে নিয়ে বলেছেন *"প্রতিদিন অফিস শেষ করে বাসায় আসি। বোবা স্ত্রী আমাকে দোরগোড়ায় দেখলেই অপরিসীম আগ্রহ নিয়ে ছুটে আসে। সে যেন সারাদিন আমার বাড়ি আসার ক্ষণটির অপেক্ষায় থাকে। হাত মুখ ধুয়ে বেরিয়ে এলে নাস্তার প্লেট এবং ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। এসব আদিখ্যেতা দেখে আমার বিরক্ত ধরে যায়। লাথি মারতে ইচ্ছে করে।"* কিন্তু একটা সময়ে গিয়ে ওই বোবা স্ত্রীকে নিয়েই তিনি বলেছেন, *"আমার চোখে তার বোবাত্ব ঘুচে গেছে। প্রতিটা ভঙ্গীই এখন আমার মনে শ্রেষ্ঠতম কবিতা।"*

উপন্যাসের বর্ণনাভঙ্গিতে প্রতিটি ঘটনার সাথে কথকের প্রবল বৈপরীত্য। কিন্তু প্রতিটিকে আবার কথক পছন্দ করে ফেলেছেন। হোক তা বাধ্য হয়ে কিংবা স্বেচ্ছায়। এটাও উপন্যাসের একটা অলংকার। এর প্রমাণস্বরূপ আমরা দেখি লেখক ওই সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বোঝাতে মিছিলের দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। কিন্তু এই মিছিলটাই পছন্দ ছিল না তার। একটা সময়ে সেটাকেও পছন্দ করে ফেলেন। তিনি মিছিল নিয়ে বলছেন, *"মিছিল ভয়ঙ্কর, মিছিল সুন্দর। মিছিলে ধ্বনিত হয় ভাঙনের ধ্বংস নাদ, মিছিলে জাগে নবসৃষ্টির মহীয়ান সঙ্গীত।"*

সবমিলিয়ে এই উপন্যাসকে কোনো ক্যাটাগরিতে ফেলতে পারিনি। তবে ইতিহাস জানার এবং বোধের জায়গায় চমৎকার চিন্তার খোরাক দিয়েছে এই উপন্যাস। বলতে দ্বিধা নেই অনন্য কিছু একটা পড়লাম আমি।

***** আহমদ ছফার উপন্যাস 'ওঙ্কার' নিয়ে লিখেছেন শিশু সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মাহবুব এ রহমান। একুশে বইমেলা '২১ এ তার 'ভূত স্যার' বইটি ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা পায়।***

এক জেলেকন্যার সম্রাজ্ঞী হয়ে ওঠার গল্প

অরিত্র রোদ্দুর ধর

'মৎস্যগন্ধা' কুশলী লেখক হরিশংকর জলদাসের মুনশিয়ানার এক অনন্য উদাহরণ। *'জলপুত্র'*, *'দহনকাল'*, *'রামগোলাম'* কিংবা *'সুখলতার ঘর নেই'* এর পর এই উপন্যাসে লেখক হরিশংকর জলদাসের জীবনদর্শন হয়ে উঠেছে আরও স্পষ্ট।

এক কথায় বলতে গেলে এই উপন্যাস এক কৈবর্তকন্যার রাজমহিষী হয়ে ওঠার গল্প। এই গল্প যেমন অনুপ্রেরেণার, তেমনি এক জেলেনীর মর্মন্তুদ লড়াইয়ের। যে জেলেনারী মাত্র উনিশ বছর বয়সে ঋষি পরাশর দ্বারা ধর্ষিতা, সেই নারী কীভাবে হয়ে উঠলেন প্রাচীন ভারতের এক গুরুত্বপূর্ণ জনপদের সম্রাজ্ঞী, সেই গল্পই এই উপন্যাসে কুশলী কলমে লিখেছেন লেখক।

মৎস্যগন্ধা অর্থাৎ সত্যবতী মহাভারতের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র কিন্তু এ উপন্যাস শুধু ধর্মের কাহিনীকথা নয় বরং ধর্মের কাহিনীকথার পটভূমিতে হয়ে উঠেছে সমাজের তথাকথিত 'উপরতলার' মানুষদের প্রতি ঘৃণা ও ক্ষোভের প্ল্যাটফর্ম। যেখানে লেখক প্রাচীন সমাজের ছাঁচে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন বর্তমান সমাজেরই নানা অসঙ্গতির কথা।

উপন্যাসটি যেমন গেয়েছে ভালোবাসার জন্য ত্যাগের জয়গান, অন্যদিকে এ উপন্যাসে সরল, ভানমুক্ত ভাষায় উঠে এসেছে এক কন্যার ভবিষ্যৎ–শংকিত পিতার হঠাৎ স্বার্থলোভী হয়ে ওঠার গল্প। শ্রদ্ধা কিভাবে এক পুত্রকে ভীষণ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করে ভীষ্ম করে তুলেছে সে উপাখ্যান ভাবিয়েছে পাঠককে। এ উপন্যাসের মৎসগন্ধার ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প যেমন আমাদের অনুপ্রেরেণা দিয়েছে ঠিক তেমনই তাঁর অনভিজ্ঞতার ফসলে প্রাসাদের বিশৃঙ্খলতার ট্র্যাজেডি কাঁদিয়েছে আমাদের।

মুলকাহিনীর সাথে মিশে থাকা উপকাহিনীগুলোর প্রাসঙ্গিকতা সেইসাথে ছোট থেকে বড় সব চরিত্রের দক্ষ চরিত্রাঙ্কন এই উপন্যাসকে করে তুলেছে জীবন্ত। কিন্তু কিছুক্ষেত্রে লেখকের বর্ণনার বাহুল্য পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে পারে। আবার সেসব বর্ণনা বেশ প্রাসঙ্গিক হওয়ায় জ্ঞানপিপাসু পাঠকের জন্য তা হয়ে উঠবে মস্তিষ্কের খোরাক। ধর্মকে সমীহ না করে হাজার হাজার বছরের বহু প্রচলিত সত্যকে উল্টে দেবার যে সাহস লেখক দেখিয়েছেন, তা অনেকের মনে বিরূপ প্রভাব ফেললেও

প্রশংসাও কুড়িয়েছে অনেক। বহু অপ্রিয় সত্যের রহস্য উদঘাটন আপনার বিশ্বাসী মনকে ঠেলে দিতে পারে দোলাচলে।

ঘটনার ক্রমে এ গল্প একদিকে মৎস্যগন্ধা বা সত্যবতীর জীবনযুদ্ধ জয়ের, অন্যদিকে পরাজয়েরও বটে। এই উপন্যাস ধর্মের পটভূমিকায় প্রচলিত সমাজের ধ্যান–ধারণার বাইরের এক বিস্তৃত জগৎ, যে জগতে যৌনতা, কূটকৌশল, স্বার্থপরতা, দূরভিসন্ধি একেকটি স্বতন্ত্র চরিত্র। সেই জগতের জীবনযুদ্ধে মৎস্যগন্ধার ঘুরে দাঁড়াবার লড়াই। কেমন সে লড়াই? এই লড়াইয়ে জয় কার? মৎস্যগন্ধার? না দেহলোভীদের? সেসব প্রশ্নের উত্তর পেতে পড়তে হবে দক্ষ শিল্পী হরিশংকর জলদাসের অনবদ্য উপন্যাস *'মৎস্যগন্ধা'*।

***** 'মৎস্যগন্ধা' কথাসাহিত্যিক হরিশংকর জলদাশের লেখা একটি জনপ্রিয় উপন্যাস। ফেব্রুয়ারি '২১ –এ 'কথাপ্রকাশ' প্রকাশনা থেকে বইটি প্রকাশিত হয়। প্রেক্ষার এই আয়োজনে 'মৎস্যগন্ধা' নিয়ে লিখেছেন– অরিত্র রোদ্দুর ধর; তিনি ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী।***

লেখা আহ্বান

প্রিয় পাঠক

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে প্রেক্ষার ষষ্ঠ সংখ্যা।
যে কোন বইয়ের পাঠ–পর্যালোচনা লিখে পাঠাতে পারবেন এই সংখ্যায়। তাই নিজের পঠিত পছন্দের বই নিয়ে ঝটপট লিখে ফেলুন চমৎকার একটি ***'পাঠ–পর্যালোচনা'***। লেখাটি ৫০০ থেকে ১০০০ শব্দের এবং বিজয় SutonnyMJ ফন্টের হলে ভালো হয়।

২০ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত লেখা পাঠানো যাবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা:

cuabrittimancho2000@gmail.com

যেকোনো প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চের **facebook page**–এ।

[প্রচলিত অর্থে ***'বুক রিভিউ'*** বলতে যা বুঝায় আমাদের ***'পাঠ–পর্যালোচনা'*** তা নয়। বুক রিভিউতে বইয়ের আকর্ষণীয় কিছু অংশ তুলে ধরে বইটি পাঠে উদ্বুদ্ধ করা হয়। প্রকাশকগণ বইয়ের কাটতি বাড়ানোর জন্যেও এরকম *'রিভিউ কন্টেন্ট'* তৈয়ার করে থাকেন।

আমরা পাঠ–পর্যালোচনা পরিভাষাটিকে আরেকটু ওজনদার মনে করি। পাঠ–পর্যালোচনায় পাঠক নির্দিষ্ট কোন বইয়ের ব্যাপারে নিজের ভালোলাগা-মন্দলাগা ব্যক্ত করবেন। এই ভালো–মন্দের পরিসরে ইতিহাস, রাজনীতি, ধর্ম, মূল্যবোধ, সাহিত্যরুচি ইত্যাদির সবক'টিই বিরাজমান থাকবে। পর্যালোচনার প্রয়োজনে পাঠ–পর্যালোচনায় বইয়ের সমাপ্তি বা মূল চরিত্রের পরিণতিও জরুর আসতে পারে; প্রচলিত বুক রিভিউতে যা দূষণীয় বলে বিবেচিত হয়। - *মাসুম বিল্লাহ আরিফ, সম্পাদক*]

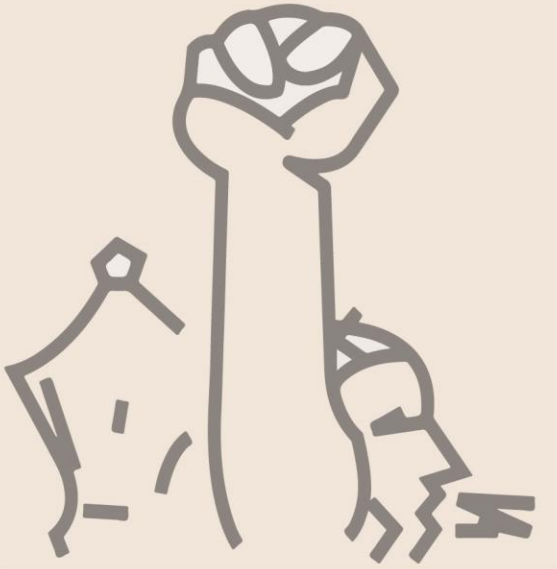

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ